

দর্পণ

জে. ডি. বেরেসফোর্ড

দর্পণ (The Looking-Glass)

জে. ডি. বেরেসফোর্ড

*From The Best British Short Stories of
1922*

সম্পাদক: এডওয়ার্ড জে. ও'ব্রায়েন ও জন
কর্নোস



অনুবাদ • এস হক

প্রচ্ছদ • ক্যাটালগ

সহযোগিতায় • আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

র‍্যাচেলের জীবনে এই প্রথম তার ফুফুর কাছ থেকে কোনো চিঠি এল।

“আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তোমার ফুফু আমাকে ক্ষমা করেছেন,” টেবিলের ওপর দিয়ে চিঠিটি এগিয়ে দিতে দিতে তার বাবা বললেন।

র‍্যাচেল প্রথমেই স্বাক্ষরের দিকে তাকাল। সেখানে নিজের নাম দেখে তার অদ্ভুত লাগল। যেন একই নামে দুজন র‍্যাচেল ডিন থাকা তার নিজস্ব সত্তা, তার পরিচয়কেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ফুফুর হাতের লেখার সঙ্গে তার নিজের লেখারও মিল ছিল—অক্ষরের বাঁকে এক বিশেষ ভঙ্গি, দৃঢ়তা ও নিখুঁততার ইঙ্গিত। র‍্যাচেল যদি পঞ্চাশ বছর আগে বড় হতো, হয়তো ঠিক এভাবেই নিজের নাম লিখত।

“কিছু কিছু দিক দিয়ে তুমি তার মতোই,” বাবা বললেন।

র‍্যাচেলের চোখের পাতা নেমে এল। মুখে ফুটে উঠল বাবার মন্তব্যের প্রতি চাপা বিরক্তি। তিনি একই কথা বারবার, একই সুরে বলতেন; তাই তার অনেক বক্তব্য সত্য হলেও র‍্যাচেল অভ্যাসবশত তা প্রত্যাখ্যান করত। বাবাকে তার বরাবরই

বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষ বলে মনে হতো।
র‍্যাচেলের জন্মের সময় তাঁর বয়স পঞ্চাশ
পেরিয়েছিল, আর ছোটবেলা থেকেই র‍্যাচেল
তাঁর কথার নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ করত। সে
নিজেকে বলত, “আমি জন্মগত সংশয়বাদী—
একেবারে আধুনিক।” সুদূর অতীতের প্রতি তার
কিছুটা শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু বাবার যুগের প্রতি নয়।

“ভিক্টোরীয় মানসিকতা” তার কাছে গালির মতো
শব্দ। উনিশ শতকের নীতি ও রুচি—বাবার
মতামতে যার প্রতিফলন দেখত—সে বহু আগেই
বাতিল করে দিয়েছে। তাই নিজের ভাবনার সঙ্গে
বাবার পরিচিত মন্তব্যের এমন অদ্ভুত মিল থাকা
সত্ত্বেও সে তাঁকে বিশ্বাস করতে পারল না।

তবু বরাবরের মতো উত্তর দিল কোমল স্বরে;
নিজের যৌবন ও প্রাণশক্তির উচ্চ আসন থেকে
নেমে এসে যেন তাঁকে করুণা করল।

“আমার তো মনে হয়, ফুফু র‍্যাচেলকে দেখতে
কেমন ছিলেন, তা আপনি প্রায় ভুলেই গেছেন,
বাবা। তাঁকে শেষ দেখেছেন কত বছর আগে?”

“চল্লিশ বছরেরও বেশি—চল্লিশেরও বেশি,” বাবা
গভীরভাবে স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন।

“আমাদের মতের মিল হতো না, কখনোই হতো না। র‍্যাচেল সব সময় নিজেকে আধুনিক বলে গর্ব করত। হাক্সলি, ডারউইন—এসব পড়ত। ওসব আমার বোধের বাইরে ছিল, স্বীকার করছি। তবু আমার মনে হয়, পুরোনো সত্যগুলো টিকে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে—সব কিছুর পরেও।”

র‍্যাচেল কাঁধ সোজা করে মাথা তুলল। মুখে অবজ্ঞা থাকলেও কণ্ঠে তা প্রকাশ পেল না। “তাহলে মনে হচ্ছে, তিনি আমাকে দেখতে চান।”

এমন এক ফুফুর সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল—যাঁর কথা এত শুনেছে যে তিনি প্রায় কিংবদন্তির মানুষ। কখনো কখনো র‍্যাচেলের মনে হয়েছে, এই অসাধারণ আত্মীয়ের ব্যক্তিত্ব হয়তো বাবার কল্পনা; বহুদিন ধরে মনে মনে সাজানো, আধভোলা স্মৃতি থেকে নতুন করে গড়া কোনো চরিত্র। কিন্তু সকালের নাশতার টেবিলে রাখা চিঠিটি ছিল তার নিজের স্বভাবের সঙ্গে মানানসই। চিঠির সংযত ভঙ্গিতেই যেন খানিকটা ঔদ্ধত্য ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে। ভাষা সদয়, কিন্তু সেই সদয়তার

ভেতরেও করুণার সুর। বাবার বর্ণনার সঙ্গে সবই
মিলে যায়।

মি. ডিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্মৃতি থেকে ফিরে
এলেন। “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তোমাকে দেখতে চায়।
আমার মনে হয়, তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে
কিছুদিন তার কাছে থাকা উচিত। সে বেশ ধনী—
প্রায় বিপুল সম্পদের মালিক। আর তুমি জানো,
তোমার জন্য রেখে যাওয়ার মতো আমার প্রায়
কিছুই নেই। যদি সে তোমাকে পছন্দ করে...”

তিনি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। র‍্যাচেল বুঝল,
বাবার অতীতের আর্থিক দুর্বলতার জন্য তিনি
আবারও অনুতাপ করছেন। একসময় তাঁর যথেষ্ট
সম্পদ ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন জল্পনা-কল্পনায় তা
ধীরে ধীরে নষ্ট করেছেন। বাবার সঙ্গে তাঁর বোন
সমান উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন; অথচ বাবাকে
শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট অর্থের বড় অংশ দিয়ে
বার্ষিক ভাতার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, আর বোন
সম্ভবত নিজের সম্পদ আরও বাড়িয়েছেন।

“আপনি যদি আমাকে পুরো দুই সপ্তাহের জন্য
ছাড়তে পারেন, নিশ্চয়ই যাব,” র‍্যাচেল বলল।

“এই অসাধারণ ফুফুকে দেখার জন্য আমি অধীর। আচ্ছা, তাঁর বয়স কত?”

“আমাদের বয়সের ব্যবধান মাত্র পনেরো মাস,” বাবা বললেন। “তাহলে তাঁর বয়স—আরে, হ্যাঁ, তিয়ান্তুর হবে। ভাবো তো, র্যাচেলের বয়স তিয়ান্তুর! আমি তো তাঁকে সব সময় তোমার বয়সী বলেই ভাবি। তাঁকে বুড়ি ভাবাটা কী অদ্ভুত!”

তিনি আরও বলতে থাকলেন, কিন্তু র্যাচেল আর শুনছিল না। বাবা যেন তরুণদের কাছ থেকে বোঝাপড়া চাইছিলেন; নিজের বার্ধক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন অবস্থায় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে মেয়ের সহানুভূতি ছুঁতে চাইছিলেন। অথচ র্যাচেল তখন নিজের অভিযানে মগ্ন—লন্ডনে যাওয়ার আনন্দে, যেখানে রহস্যময় ফুফুকে দেখার চেয়েও আকর্ষণীয় কিছু অপেক্ষা করছিল।

আমন্ত্রণটি ঠিক সময়েই এসেছিল। পরে সকালে র্যাচেল ভাবল, তার ভাগ্য যেন রোমান্টিক কোনো নিয়তির হাতে পরিচালিত হচ্ছে। অ্যাড্রিয়ান ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি আবার দেখা

হবে, তা সে আশা করেনি। তাদের মাত্র তিনবার দেখা হয়েছে, কিন্তু দুজনেই বুঝেছিল—যদিও অ্যাড্রিয়ান শহরে ফিরে যাওয়ার আগে সম্পর্কটি এত নতুন ছিল যে কেউই সেই উপলব্ধি স্বীকার করার সাহস পায়নি। তার দুটি চিঠিতে অ্যাড্রিয়ান মুখে বলতে না-পারা অনেক কথাই ইঙ্গিতে জানিয়েছিল। সে সংবেদনশীল, আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে; অথচ বাবার মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো র‍্যাচেল কঠোরভাবে সমালোচনা করত, অ্যাড্রিয়ানের মধ্যে সেগুলোকেই সে ভালোবাসত।

সে চিঠি দুটো আবার পড়ল, আনন্দে শিহরিত হলো। উত্তরে এমন এক আশ্চর্য খবর দেবে, যা অ্যাড্রিয়ানকে চমকে দেবে। একেবারে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, চিঠির শেষের দিকে লিখবে: “প্রসঙ্গত, শিগগিরই হয়তো আমাদের আবার দেখা হবে। আমি টাভিস্টক স্কোয়ারে ফুফু মিস ডিনের কাছে থাকতে যাচ্ছি।” আপাত-নির্লিপ্ত এই কথার আড়ালে কী আনন্দ লুকিয়ে আছে, অ্যাড্রিয়ান বুঝে যাবে। র‍্যাচেল তাকে বলেছিল, সে কখনোই লন্ডনে যায় না; জীবনে মাত্র একবার সেখানে গিয়েছে।

নিজের ঘরে সে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নিজেকে দেখল। খুতনি উঁচু করল, ঠোঁট সামান্য
সংকুচিত করল, আধবোজা চোখে নিজের
প্রতিবিশ্বের দিকে ঔদ্ধত্যভরে তাকাল।

খোলাখুলিই সে নিজেকে পছন্দ করত; কিন্তু
সেই সঙ্গে অবজ্ঞাপূর্ণ সমালোচকের ভঙ্গিটাও
তার অজান্তে এসে যেত। এতে নিজের সততা
সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ত, আর কখনো
হঠাৎ আয়নায় নিজেকে দেখে যে সামান্য
সন্দেহের ছায়া তার মনে পড়ত, তা ঢাকা পড়ে
যেত।

সেদিন সকালে অবশ্য কোনো সন্দেহ তার
আনন্দে দাগ কাটেনি। তার মনে শান্ত এক
ক্ষমতার অনুভূতি জেগেছিল—সে চাইলে
অ্যাড্রিয়ানকে মুগ্ধ করতে পারবে। অভ্যাসমতো
কোমল ভঙ্গিতে হাত তুলে আঙুলের ডগা দিয়ে
নিজের গাল ছুঁয়ে দিল।

টাভিস্টক স্কোয়ারে পৌঁছালে বয়স্ক গৃহপরিচারিকা
র্যাচেলকে সোজা তার শোবার ঘরে নিয়ে
গেলেন। পথে দোতলার বিশাল বসার ঘরটি
দেখিয়ে দিলেন; আধঘণ্টা পর সেখানে চা
পরিবেশন করা হবে, আর র্যাচেলের সঙ্গে তার

আশ্চর্য ফুফুর প্রথম দেখা হবে। র‍্যাচেল এতক্ষণ ছিল উত্তেজিত ও উদ্গ্রীব। লন্ডনের পরিবেশ ও সম্ভাবনা তাকে রোমাঞ্চিত করেছিল, কিন্তু বড় বাড়িটির আবহে এমন কিছু ছিল যা তাকে অস্পষ্টভাবে দূরে ঠেলে দিচ্ছিল—প্রায় অশুভ এক অনুভূতি।

শোবার ঘরটি দামি আসবাবে সাজানো, পরিচ্ছন্ন ও যত্নে রক্ষিত। কয়েকটি জিনিস সম্ভবত আসল প্রাচীন নিদর্শন, হয়তো বিপুল মূল্যবান।

কিন্তু এখানে সে কীভাবে স্বচ্ছন্দ হবে? ভঙ্গুর, বয়স্ক আসবাবের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। বাইরে থেকে কী সুন্দর সংরক্ষিত, অথচ ভেতরে যেন সবই দুর্বল ও জীর্ণ।

সরু পায়ার লেখার টেবিল আর অতিরিক্ত কারুকর্মময় লুই-পঞ্চদশ যুগের সোফাটি কোনো জাদুঘরে অবসর কাটানোর কথা। একটিতে লিখতে বসা বা অন্যটিতে বসা যেন তাদের প্রতি অশোভন আচরণ। শুকনো পচনে প্রাণশক্তি হারিয়ে, ব্যবহারযোগ্য জীবন শেষ করেও তারা নির্বোধের মতো কাজের ভান করে আছে।

“কখনো নিজের বাড়ি হলে,” র‍্যাচেল ভাবল,
“এমন আসবাব কিনব, যেগুলো ব্যবহার করতে
ভয় পেতে হবে না।”

সে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।
স্কোয়ারে পাশের বাড়ির সামনে একটি
মোটরগাড়ি এসে থামল; ইঞ্জিনের গর্জন, দরজা
বন্ধ হওয়ার শব্দ, তারপর এক পুরুষের দৃঢ়,
গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল। প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী
জিনিসের জগৎই তার নিজের উপযুক্ত
পরিবেশ—এমনটাই মনে হলো তার। মাত্র বিশ
মিনিটেই ঘরটির মধ্যে সে যেন অবসন্ন হয়ে
পড়েছে, যেন তার নিজের মধ্যেও সেই শুকনো
পচন ধরতে শুরু করেছে।

বসার ঘরে নামার সময় তার উদ্বেগ বাড়ছিল।
আধঘণ্টা আগেও ধনী, ভীতিপ্রদ ফুফুকে সে
কল্পনা করেছিল বলিষ্ঠ ও স্কুলদেহী এক নারী
হিসেবে—যিনি সরাসরি কথা বলেন এবং নতুন
আবিষ্কৃত ভাতিজিকে খুঁটিয়ে বিচার করবেন।
এখন তার ধারণা বদলে গেছে। মনে হচ্ছে, ফুফু
হয়তো দুর্বল, খিটখিটে, বয়সের তুলনায়ও বেশি
বৃদ্ধ এক নারী; যাঁর সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলতে

হবে এবং তাঁর আসবাবের মতোই অতি সাবধানে
আচরণ করতে হবে।

বসার ঘরের দরজায় হাত রেখে র্যাচেল থামল।
এই সফরে কত সংযম আর স্নায়ুর চাপ সহ্য
করতে হবে, তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘরে
তুকে প্রায় পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে
এগোল, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বিস্ময় ও
ধাক্কায় সে হতবুদ্ধি। যা-ই আশা করুক, এ দৃশ্য
তার কল্পনায় ছিল না।

সামনে দাঁড়ানো রঙচঙে, সাজগোজে ঝলমলে
প্রাণবন্ত নারীটি তার ফুফু হতে পারেন—প্রথমে
সে তা বিশ্বাসই করতে পারল না। মাথায় উঁচু করে
বসানো ঘন বাদামি পরচুলা, অস্বাভাবিক কালো
করে আঁকা ভুরু, পাউডারে শক্ত হয়ে থাকা গাল,
ঠোঁটে চড়া লাল রং। চায়ের টেবিলের সামনে
মাথা সামান্য পেছনে হেলিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে
ছিলেন, ভাতিজির দিকে তাকিয়ে যেন উদার
প্রশ্নই দিচ্ছেন।

মিস ডিনের মধ্যে বয়সের কোনো স্বীকারোক্তি
ছিল না। তাঁর সাজ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের, কিন্তু
ভঙ্গিতে ছিল আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণতা এবং এমন এক

ঔদ্ধত্য, যা র্যাচেলের নিজের ভঙ্গির সঙ্গে
অস্বস্তিকরভাবে মিলে যায়। ফুফু তাকে
এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন বহুদিনের
পরিচিত কাউকে সামান্য সৌজন্য দেখাচ্ছেন;
র্যাচেলও দ্রুত বুঝল, এ বাড়ির কর্তৃত্ব তাঁর হাতে
এবং তিনি নিজের বয়সকে কোনোভাবেই নিজের
পরিচয়ের অংশ হতে দিতে চান না।

চায়ের সময় কথাবার্তায় র্যাচেল লক্ষ করল, ফুফু
অতীত নিয়ে কথা বললেও নিজেকে অতীতের
মানুষ বলে মনে করেন না। তিনি নিজের
মতামতকে বর্তমানের চেয়ে এগিয়ে থাকা মত
বলেই উপস্থাপন করেন। র্যাচেলের বাবার বর্ণনা
থেকে যে আধুনিক, আত্মপ্রত্যয়ী নারীটির ছবি সে
গড়েছিল, তার সঙ্গে এই অদ্ভুত সাজপোশাকের
নারীর মিল আছে। তবে ফুফুর কথার ভেতর
এমন এক হিসাবি কৌতুকও ছিল, যেন তিনি
অন্যদের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে তা উপভোগ
করেন।

র্যাচেল প্রথমদিকে নিজের স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস
নিয়ে তাঁর সামনে বসেছিল। কিন্তু বাড়ির
পুরোনো আসবাব, ফুফুর অস্বাভাবিক
যৌবনসুলভ সাজ এবং নিজের প্রতিবিশ্বের প্রতি

তাঁর আসক্তি—সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অস্বস্তি
তার মধ্যে জন্মাতে লাগল। আয়নাটি যেন এই
বাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। মিস ডিন
বারবার সেটির দিকে তাকাতেন, নিজের মুখভঙ্গি
পরীক্ষা করতেন, গালের ওপর আঙুল বুলিয়ে
নিতেন; যেন আয়নায় দেখা ছবিটিই তাঁর প্রকৃত
সত্তা, আর বাকি সবকিছু কেবল তার চারপাশের
সাময়িক বাস্তবতা।

দিন গড়াতে র্যাচেল বুঝতে পারল, ফুফুর সঙ্গে
তার মিল কেবল চেহারায় নয়, আচরণেও।
দুজনেই নিজেদের প্রতি মুগ্ধ, দুজনেই নিজেদের
চেহারা ও ভঙ্গির ওপর এক ধরনের অধিকার
অনুভব করে। তবে মিস ডিনের আত্মবিশ্বাস যেন
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার
অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের
বয়সের কথা এড়িয়ে যান; বৃদ্ধ বয়সকে যেন
অন্য কারও সমস্যা বলে মনে করেন।

র্যাচেলও একসময় আয়নার সামনে নিজের
সৌন্দর্য পরীক্ষা করত। নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে
তাকিয়ে খুতনি উঁচু করা, ঠোঁট সামান্য বাঁকানো,
চোখ আধবোজা করে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে
তাকানো—এসব ছিল তার পরিচিত আচার। কিন্তু

ফুফুর সঙ্গে থাকার সময় সে লক্ষ করল, এই অভ্যাস তার নিজের মধ্যেও কতটা গভীর। মিস ডিনের একই ভঙ্গি দেখলে কখনো তার বিরক্তি হতো, কখনো মনে হতো, যেন নিজেরই প্রতিচ্ছবি অন্য এক বয়সের শরীরে দেখতে পাচ্ছে।

এদিকে অ্যাড্রিয়ান ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কও এগোচ্ছিল। র্যাচেল তাকে ভালোবাসত, কিন্তু ভালোবাসার মধ্যেও নিজের আকর্ষণ সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাস প্রবল ছিল। সে ধরে নিয়েছিল, অ্যাড্রিয়ান তাকে যেমন দেখেছে, তেমনই ভালোবাসে—তার সৌন্দর্য, তার আত্মবিশ্বাস, তার অভিনব ভঙ্গি। নিজের এই ধারণা নিয়ে সে কখনো প্রশ্ন তোলেনি।

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে র্যাচেলের মনে হলো, সে যেন নিজের প্রতিবিশ্বকে একটু দূর থেকে দেখছে। সেই চেনা ভঙ্গি, সেই চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের সামান্য বাঁক—সবই আছে; অথচ প্রতিচ্ছবিটির প্রতি আগের মতো নিঃশর্ত মুগ্ধতা আর রইল না। যেন আয়না তাকে এমন এক সত্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা সে দেখতে চায়

না। সে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু ভাবনাটি
আর পুরোপুরি তাড়াতে পারল না।

মিস ডিনের সঙ্গে তার কথাবার্তায় বারবার বোঝা
গেল, ফুফু নিজের যৌবনকে শুধু সাজসজ্জা
দিয়ে ধরে রাখতে চান না; তিনি বিশ্বাস করেন,
বয়স মেনে নেওয়ার ধারণাটাই মানুষকে বুড়ো
করে। যে ব্যক্তি নিজেকে বৃদ্ধ বলে ভাবতে শুরু
করে, তার মধ্যে বার্ধক্য ঢুকে পড়ে। এই
বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের জেদ ছিল, আবার
ছিল ভয়ের আভাসও। র্যাচেল বুঝতে পারল,
ফুফুর সমস্ত আত্মবিশ্বাসের তলায় লুকিয়ে আছে
বয়সের কাছে পরাজিত হওয়ার আতঙ্ক।

র্যাচেল অ্যাদ্রিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে
যেত, আবার ফুফুর বাড়িতে ফিরে আসত।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাদ্রিয়ান মিস ডিনকে নিয়ে
আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

র্যাচেল তাঁর সম্পর্কে খুব কম কথা বলত, আর
সেই নীরবতা অ্যাদ্রিয়ানের মনে সন্দেহ তৈরি
করেছিল। তার কাছে মিস ডিনও যেন প্রায়
কাল্পনিক চরিত্র—যেমন একসময় র্যাচেলের
কাছেও ছিলেন।

একদিন অ্যাড্রিয়ান ঈর্ষা ও উদ্বেগের তীব্রতায়
জিঙেস করল, “তুমি কী লুকোচ্ছ? তুমি কি
সত্যিই টাভিস্টক স্কোয়ারে তোমার ফুফুর সঙ্গে
থাকো?”

র্যাচেল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, “বিশ্বাস না হলে
নিজেই এসে দেখে যাও। আজ বিকেলে
এসো—চা খেতে।”

পরে অ্যাড্রিয়ান তার অযৌক্তিক সন্দেহের জন্য
বিনীতভাবে ক্ষমা চাইতে চাইলেও র্যাচেল
আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিল না। আমন্ত্রণ দেওয়ার
সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে স্বস্তি এসেছিল—যেন
নিজের দুর্বলতা সে অবশেষে স্বীকার করেছে।
অ্যাড্রিয়ানের এই আগমন সেই স্বীকারোক্তিকে
সম্পূর্ণ করবে; তারপর তার আর কোনো
গোপনীয়তা থাকবে না। সে যদি তাকে আর
ভালোবাসতে না পারে, তবু ভালো—একটি মিথ্যা
প্রতিমাকে বিয়ে করে ধীরে ধীরে সত্য
আবিষ্কারের চেয়ে এটাই শ্রেয়।

“হ্যাঁ, আজ বিকেলেই এসো। চারটার দিকে
তোমার জন্য অপেক্ষা করব”—এটাই ছিল
র্যাচেলের শেষ কথা। এবার তাকে ফুফুকে

জানাতে হবে; অথচ মিস ডিন তখনও জানেন না যে অ্যাড্রিয়ান ফ্লেমিং নামে কেউ আছে। র‍্যাচেল দুপুরের খাবারের পর পর্যন্ত কথাটা স্থগিত রাখল। ফুফুকে সে অনেকটাই বুঝাতে শিখেছিল, কিন্তু এই খবর শুনে তিনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, তা বুঝতে পারছিল না।

হয়তো বিরক্ত হবেন, হয়তো ভাববেন তাঁর প্রিয় আয়নাটি কেউ কেড়ে নিতে এসেছে। কিন্তু আর দেরি করার উপায় ছিল না। আধঘণ্টার মধ্যে মিস ডিন বিশ্রাম নিতে ওপরে যাবেন, আর তার আগেই অ্যাড্রিয়ান বাড়িতে এসে পড়বে।

“ফুফু, আপনাকে একটা কথা বলার আছে,”
র‍্যাচেল হঠাৎ বলল।

মিস ডিন নাকের ওপর চশমাটি তুলে নিজের সুন্দর প্রতিকৃতির দিকে আগ্রহভরে তাকালেন।

“ফুফু, আপনাকে আগে বলা উচিত ছিল, কিন্তু বলিনি। আমি... আমি অ্যাড্রিয়ান ফ্লেমিং নামে একজনের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা। আজ বিকেল চারটায় সে আপনার সঙ্গে—আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।”

মিস ডিন চোখ বন্ধ করে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস
ফেললেন। “আর একটু আগে জানাতে পারতে,
প্রিয়।”

“এখনো দুটো বাজেনি,” র্যাচেল বলল। “প্রস্তুত
হওয়ার জন্য দুই ঘণ্টারও বেশি সময় আছে।”

মিস ডিন সামান্য অভিমানী ভঙ্গি করলেন। “ও
আসার আগে আমার বিশ্রাম দরকার। তুমি
নিশ্চয়ই তাকে আমাদের কথা বলেছ?”

“আপনার কথা?” র্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

ফুফু আত্মতৃপ্তভাবে মাথা নাড়লেন।

“খুব বেশি নয়,” র্যাচেল স্বীকার করল।

লম্বা হাতলওয়ালা চশমা দিয়ে মজা করে
র্যাচেলকে শাসানোর সময় মিস ডিনের
চোখেমুখে স্পষ্ট ধূর্ততা ফুটে উঠল।

“তাহলে সে এখনো জানে না যে আমাদের দুজন
আছে? আহা, ওর জন্য ব্যাপারটা একটু চমকপ্রদ
হবে না?”

র্যাচেল গভীর শ্বাস নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল।
“হ্যাঁ,” সে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, “সম্ভবত হবে।”

সেই মুহূর্তে তাদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আর কখনো
এত অসহনীয় মনে হয়নি। ফুফু ঠিক সেই
ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যে ভঙ্গি
একসময় আয়নার নিজের প্রতিবিশ্বের মধ্যে
দেখে র্যাচেল মুগ্ধ হতো—এবং সে জানত,
অ্যাড্রিয়ানও সেই ভঙ্গিতে মুগ্ধ। এই অভ্যাস
থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারত না।

এটি তার স্বভাবের গভীরে গেঁথে ছিল। গত এক
মাসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে
কাটানো আনন্দময় মুহূর্তগুলো ছেড়ে দিতে
হয়েছে—এটিই যেন তার সবচেয়ে বড় শাস্তি।
তার মনে হয়েছে, সে যেন নিজেকেই হারিয়েছে;
নিজের সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে আরাধ্য সঙ্গীকে
হারিয়েছে।

মিস ডিন উঠে দাঁড়ালেন। শরীর টানটান করে,
ছোট ছোট কৃত্রিম পদক্ষেপে কনসোল টেবিলের
ওপরের লম্বা আয়নার দিকে এগিয়ে গেলেন।
র্যাচেল নিঃশ্বাস আটকে দেখল। আসন্ন
প্রেমিকের কথা ভেবে ফুফু যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে

নিজের সৌন্দর্য উপভোগ করার পুরোনো
অভ্যাসে ফিরে যাচ্ছেন। গত চার সপ্তাহে
আয়নায় দেখা জীবন্ত প্রতিবিশ্বের সঙ্গে নিজের
বর্তমান প্রতিচ্ছবির তুলনা করে তিনি কি
অবশেষে নির্মম সত্যটি বুঝতে পারবেন?

কিন্তু মনে হলো, বৃদ্ধা যেন অন্ধ। আয়নার সামনে
দাঁড়িয়ে তিনি বিস্ময়ে চমকালেন না, মুখে
উদ্বেগের কোনো চিহ্নও দেখা গেল না। বাঁ হাতে
ধরা চশমাটি পাশে ঝুলে রইল; ডান হাতের
আঙুলের ডগা দিয়ে তিনি নিজের বসে যাওয়া
গালের খাঁজ আলতো করে ছুঁয়ে দেখতে
লাগলেন।

র‍্যাচেল আর দৃশ্যটি সহ্য করতে পারল না। এক
ধরনের প্রতিবাদের অস্পষ্ট তাগিদে সে উঠে
দাঁড়াল, ঘর পেরিয়ে ফুফুর পাশে গিয়ে কাঁধে কাঁধ
মিলিয়ে আয়নার দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণ মিস ডিন স্থির রইলেন। তারপর অদ্ভুত
দ্বিধায় ডান হাত নামিয়ে ধীরে ধীরে চশমাটি
চোখে তুললেন।

র‍্যাচেলের শরীর দিয়ে বরফশীতল আতঙ্ক বয়ে
গেল। তার চোখের সামনে ভয়াবহ কিছু ঘটছিল।

ফুফু যেন মুহূর্তের মধ্যে সঙ্কুচিত হচ্ছেন, শুকিয়ে যাচ্ছেন, বুড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ভঙ্গির দৃঢ়তা হারিয়ে গেল, মাথা ঝুঁকে পড়ল; মুখের গর্বিত অবজ্ঞা সরে গিয়ে জায়গা নিল বৃদ্ধ মানুষের বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ স্মৃতিমগ্নতা। তিনি চশমা তুলে ধরে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলেন, সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠা বৈপরীত্যের দিকে ভীত চোখে চেয়ে থাকলেন।

কিন্তু হাত ও বাহু কাঁপতে শুরু করল; প্রতি মুহূর্তে তাঁর শরীর থেকে যেন প্রাণ ও শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ প্রবল চেষ্টা করে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, নিজেকে সোজা করলেন এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মুখ থেকে বেরোল তীক্ষ্ণ, সরু হাসি—যার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ, অভিমান এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া তিক্ততা।

র্যাচেল কেঁপে উঠল, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকাতে তার ভয় নেই। ফুফুর সময় শেষ। সত্যটা তাঁর জানা দরকার ছিল।

“তঁার জানা দরকার ছিল,” র্যাচেল নিজের গর্বিত প্রতিবিশ্বকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল।

এই ভাবনায় সে সান্ত্বনা খুঁজে পেল। ফুফুর সত্যটা জানা দরকার ছিল, আর র্যাচেল ছিল কেবল সেই সত্য প্রকাশের আকস্মিক মাধ্যম। সে নিজে ইচ্ছা করে তাঁকে আঘাত করতে চায়নি—নিজের সততা প্রমাণ করা ছাড়া আর কিছুই তার উদ্দেশ্য ছিল না, সে নিজেকে বোঝাল।

তবু তার নিজের আবেগের সমস্যার সমাধান হয়নি। র্যাচেলের ধারণা, ফুফু এত সহজে হার মানবেন না।

ঘর থেকে বেরোনোর সময়ও তো তিনি নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন; অ্যাড্রিয়ান উপস্থিত থাকলে আরও বড় চেষ্টা করবেন না কেন? প্রতিশোধ নিতে হলেও তিনি র্যাচেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

র্যাচেল স্থির করল, এর জবাব দেবে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। ফুফুর সামনে সে হবে নম্র ও বিনয়ী। অ্যাড্রিয়ান হয়তো বৃদ্ধার ভঙ্গির মধ্যে সেই

পরিচিত সৌন্দর্য খুঁজে পাবে, কিন্তু অন্তত
র‍্যাচেলের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পাবে না।

এই ভাবনা নিয়েই সে অ‍্যাড্রিয়ানকে গ্রহণ করল।
প্রেমিকের স্বভাবসুলভ সময়নিষ্ঠায় সে চারটার
সামান্য আগেই এসে পৌঁছেছিল।

“তুমি কি ভীষণ নার্ভাস?” দুজনে বসার ঘরে একা
হলে সে জিজ্ঞেস করল। “শহরে আমাদের প্রথম
দেখা হওয়ার দিনের মতো লাগছে তোমাকে—
তোমার স্বাভাবিক স্বভাবের থেকে আলাদা।”

“আমার চেহারা আর আচরণ তোমার কত ভালো
মনে আছে!” র‍্যাচেল বিরক্তির সুরে বলল।
“অবশ্যই আমি নার্ভাস।”

অ‍্যাড্রিয়ান ফুফু তাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন তা
জানতে চাইল, কিন্তু র‍্যাচেল কিছু বলল না।

“আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো, নিজেই
দেখবে,” সে বলল। মিনিট পেরিয়ে গেল, তবু
মিস ডিন এলেন না।

পৌনে পাঁচটার দিকে বয়স্ক গৃহপরিচারিকা চা
নিয়ে এলেন। “মিস ডিন বলেছেন, আপনাদের

তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, মিস র্যাচেল ।
তিনি একটু পরেই নিচে আসবেন—এই কথা
জানাতে বলেছেন ।”

র্যাচেলের ঠোঁটে অবজ্ঞার বাঁক ফুটে উঠল । তার
সন্দেহ হলো, ফুফু সাজগোজে বিশেষ সময়
নিচ্ছেন—হয়তো কনসোলের আয়নায় দেখা
সাম্প্রতিক দৃশ্যটি মন থেকে মুছে ফেলতে
চাইছেন ।

র্যাচেল কল্পনায় তাঁর প্রবেশের দৃশ্য দেখল: ঘাড়
শক্ত, মাথা উঁচু, যৌবনের সমালোচনা ও
বার্ধক্যের ইঙ্গিতকে অবজ্ঞা করে তিনি এগিয়ে
আসছেন ।

“আহা, তিনি আসছেন না কেন? সব শেষ করে
ফেলতে পারতাম!” র্যাচেল আবেগে বলে উঠল ।

ঠিক তখনই সিঁড়িতে কারও নামার শব্দ শোনা
গেল ।

কিন্তু তা ফুফুর পরিচিত উঁচু হিলের টুকটুক শব্দ
নয়; বরং টেনে টেনে পা ফেলার, কড়কড়ে
আওয়াজের সঙ্গে দুর্বল, প্রতিবাদী কণ্ঠের অস্পষ্ট
গুঞ্জন ।

র‍্যাচেল লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা খোলার আগেই সে সব বুঝে গেল। প্রথমে দেখা গেল ভীত, হতবাক গৃহপরিচারিকার মুখ; তিনি ধরে রেখেছেন কুঁকড়ে যাওয়া, কাঁপতে থাকা এক অতি বৃদ্ধার শরীর।

মাত্র তিন ঘণ্টা আগেও যিনি অলৌকিকভাবে তরুণী ছিলেন, যাকে এক ধারণার সর্বশক্তিমান জোর যেন ধরে রেখেছিল, এখন তিনি ভেঙে পড়া এক বৃদ্ধা।

মিস ডিন বসার ঘরে মাত্র পাঁচ মিনিট থাকলেন। তিনি ছিলেন খিটখিটে, ক্ষুদ্র এক বৃদ্ধা; মনে হচ্ছিল, তরুণদের প্রাণশক্তির প্রতি তাঁর বিদ্বেষ, আর তাদের সহানুভূতি তাঁকে বিরক্ত করছে।

গৃহপরিচারিকাকে ডেকে পাঠানো হলো, তারপর মিস ডিনকে নিয়ে যাওয়া হলো।

র‍্যাচেল উঠে দাঁড়িয়ে আগের সেই ঔদ্ধত্য নিয়ে অ্যাড্রিয়ানের দিকে তাকাল। “তুমি কি কল্পনা করতে পারো,” সে জিজ্ঞেস করল, “একসময় আমার ফুফুকে নাকি আমার মতোই দেখতে ছিল?”

অ্যাড্রিয়ান হেসে মাথা নাড়ল, যেন এমন কথা
ভাবাই হাস্যকর।

র্যাচেল ঘুরে আয়নার দিকে তাকাল। খুতনি
তুলল, ঠোঁট সামান্য সংকুচিত করল, আধবোজা
চোখে নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে আত্মতৃপ্ত
অবজ্ঞায় তাকিয়ে রইল।

“একদিন হয়তো আমিও তাঁর মতো হয়ে যাব,”
যৌবনের গর্বে, অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যে সে বলল।

অ্যাড্রিয়ান মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।
“তুমি কখনো বুড়ো হবে না,” সে বলল।

“যতক্ষণ কেউ নিজের মাথায় বুড়ো হওয়ার
ধারণা ঢুকতে না দেয়...” র্যাচেল ভাবুকভাবে
বলতে শুরু করল।

কিন্তু মিস ডিনের মনে সেই ধারণা এত
প্রবলভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে সেদিন রাতেই
তিনি মারা গেলেন।

শেষ মুহূর্তে র্যাচেল তাঁর পাশে ছিল। বৃদ্ধা
বাইবেলের একটি বাণী অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ
করার চেষ্টা করছিলেন।

“কী বললেন, প্রিয়?” র্যাচেল ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। উত্তর থেকে সে যতটুকু বুঝতে পারল, মিস ডিন বারবার বিড়বিড় করে বলছিলেন: “এখন আমরা আয়নায় অস্পষ্টভাবে দেখি, কিন্তু তখন মুখোমুখি দেখব।”



এরকম আরো বই পেতে
ভিজিট করুন
catalog.com.bd
Visit Now ➔

ক্যাটালগ